শিরোনামাহীন

সুকান্ত চট্টোপাধ্যায়

শিঞ্জিনীর বাবা লোকটাকে আমি সহ্য করতে পারি না। লোকটা ট্রাম কোম্পানিতে চাকরি করে। চাকরিটা যে খুবব সুবিধের নয় তা গত তিনবছরে আমি জেনে গেছি। কিছু কিছু মানুষ আছেন যাঁরা গোটা পৃথিবীর ওপর সারাক্ষণ তিতিবিরক্ত হয়ে থাকেন, শিঞ্জিনীর বাবা সেই দলের । একটু আগে আমি যখন এ বাড়িতে ঢুকি তখন ভদ্রলোক বাজারে বেরোচ্ছিলেন। পরণে লুঙ্গি পাঞ্জাবি, হাতে বাজারের থলি। সদরের কাছে আমাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন, হাতের প্রায় শেষ হয়ে আসা বিড়িটায় দুটো ছোট ছোট টান দিয়ে বললেন, মাস্টার, দেশের হালটা দেখেছ কি অবস্থা করে ছেড়েছে এরা? গোটা শিক্ষা-ব্যবস্থাটাকে প্রায় ধবংস করে দিয়েছে!

আমি চোখ তুলে চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আমার দেশটাকে দেখি। দেশ মানে আপাতত এই পাড়া।আটফুট রাস্তার এখানে - ওখানে গর্ত, পথের দুধারে গাছপালা, নতুন গজিয়ে ওঠা আপার্টমেন্টের সারি। শিঞ্জিনীদের পুরনো একতলা বাড়িটাই শুধু এখনও প্রমোটারের হাতে পড়েনি। সবই ভোরবেলায় রোদের সোনালি পাতে মোড়া। চেনা একটা কুকুর এসে আমার গা শোঁকে। লেজ নাড়ে। দেশের যে খুব খারাপ হাল হয়েছে তা আমি বুঝতে পারি না। একটু মাথা নেড়ে ভেতরে ঢুকি।

পড়াতে শু করবার আগে শিঞ্জিনীর মা রোজই আমাকে কড়া করে এক কাপ চা দিয়ে যান। ইদানিং পড়াতে বসে আমার খুব ঘুম পায়। আজ কড়া চা-তেও কাজ হচ্ছে না। মাথাটা ভারী হয়ে আছে।

আপনার বোধহয় রাতে ভাল ঘুম হয়নি, মানুদা। তাছাড়া কদিন দেখছি খুব অন্যমনস্ক থাকেন। পড়াশুনো থাক, আপনি বরং আজ বাড়ি গিয়ে ঘুমোন।

কথাটা বলে হাসল শিঞ্জিনী। অনিদ্রায় ক্লান্ত চোখদুটি তুলে আমি টেবিলের উল্টোদিকে বসা শিঞ্জিনীর মুখখানা দেখি। বড় বড় চোখদুটিতে বুঝি কৌতুকই ফুটে আছে। কত আর বয়স হবে মেয়েটার? হয়ত ষোল পেরিয়েছেসবে। গোলাপি স্কার্টের ওপর সাদা টপ পরে আছে। বলতে গেলে আমর চোখের সামনেই ধীর কিন্তু নিশ্চিত গতিতে পূর্ণ নারীত্বের দিকে এগোচ্ছে শিঞ্জিনী। অজান্তেই আমার চোখ চলে যায় তার শরীরের দিকে। আমি জানি আমারর দৃষ্টির সঙ্গে পাপ মিশে আছে। আমি সুদেষ্ণাকে ভালবাসি, শিঞ্জিনীকে নয়। যদিও আমি জানি সুদেষ্ণাকে আমি কোনওদিন পাব না, তবু আমি তার সব উপেক্ষা সব অপমান সহ্য করবার ক্ষমতা অর্জন করেছি। এই ছোট্ট সুন্দর নিষ্পাপ মেয়েটিকে দেখে তাহলে আজ পাপ জেগে উঠল কেন আমার মনে?

প্রাণপণে দুচোখের পাতা থেকে ক্লান্তি আর অবসাদ তাড়ানোর চেষ্টা করতে করতে আমি চেয়ারে সোজা হয়ে বসি, মুখ যথাসম্ভব গম্ভীর করে বলি, আজ তোমাকে দুটো প্রশ্ন লিখিয়ে দেব। মাধ্যমিকের কিন্তু আর খুব বেশি দেরি নেই, শিঞ্জিনী।

শিঞ্জিনী আমার কথাটা শুনল কি না বোঝা গেল না। সে এখন খোলা জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে। গত তিনবছর ধরে শিঞ্জিনীকে আমি পড়াতে আসছি। আগে সন্ধেবেলায় আসতাম, টেস্ট পরীক্ষার পর স্কুল নেই বলে ইদানীয়ং, সকালবেলায় আসি। তাতে বিকেলটা আমার ফ্রি হয়ে যায়। কথাটা বোধহয় একটু ভুলই বলা হয়ে গেল, ঠিক ফ্রি নয়, ওই সময় সপ্তাহে দুদিন আর একটা টিউশান ধরেছি। সোম থেকে শুক্রবার। ঢাকুরিয়া দাসপাড়ায়।

শিঞ্জিনীর যে আজ পড়ায় মন নেই তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। এই বয়সের মেয়েদের আমি ঠিক বুঝতে পারি না। বাইরে নভেম্বরের চমৎকার একটা দিন ধীরে ধীরে পাপড়ি মেলছিল। বড় রাস্তা থেকে অনেকটা ভেতরে বলে এই পাড়াটায় ভিড়ভাট্টা কম। তবু স্কুলগামী শিশুদের কোলাহল আমি শুনতে পাচ্ছি।

শিঞ্জিনী আমার কথার কোনও জবাব দিচ্ছে না। হয়ত আমার কথাটা ভাল করে শোনেওনি সে। তার দৃষ্টি এখন দূরের গাঢ় নীল আকাশে। সেখানে আজ মেঘ নেই, পাখি নেই। বাতাসে হিমের স্পর্শ। শীত আসছে। আর কদিনের মধ্যেই কলকাতায় পশমের কল্লোল শু হবে। বাইরে এখন সোনালি রৌদ্রের ঝর্ণাধারা বইছে আর ঘরের ভেতরে তারই আভায় শিঞ্জিনীর দূরমনস্ক কচি মুখখানা দেখতে দেখতে ছোট একটা শ্বাস ফেলে আমি বলি, এবারে শু করা যাক, শিঞ্জিনী, আর দেরি নয়!

শিঞ্জিনী ঘাড় ঘুরিয়ে একবার আমাকে দেখে, তারপর ফিক করে হেসে ফেলে বলে, আপনার চোখে কিন্তু এখনও ঘুম, মানুদা!

আমি ভয়ংকর চমকে উছি। শিঞ্জিনী কি আমার সব ব্যর্থতা সব হতাশার কথা জেনে গেছে? ও কি জানে সুদেষ্ণার কথা? সুদেষ্ণার সঙ্গে আমার শেষ দেখা মাসখানেক আগে, গোলপার্কে। সুদেষ্ণা বলেছিল, তুমি কিন্তু অনেকদিন আমাদের নতুন ফ্ল্যাটে আসনি, মানুদা! মা প্রায়ই তোমার কথা বলেন, আসলে পুরনো পাড়ায় আর যাওয়াও হয় না... তোমার মা ভাল আছেন? জান, আমার আর একটা প্রমোশন ডিউ হয়ে গেছে... তুমি কিন্তু ঠিক আগের মতই রয়ে গেছ।

হ্যাঁ, এটা ঠিক যে রাতে আমার ভাল ঘুম হয়নি। কদিনই এরকম হচ্ছে। ছেঁড়া ছেঁড়া ঘুম, ঘুমের ভেতরে অদ্ভুত সব স্বপ্ন। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে জাগরণের প্রায় প্রতিটি মুহূর্তে আমি যার কথা ভাবি সেই সুদেষ্ণা কিন্তু কোনওদিন স্বপ্নে আমাকে দেখা দেয়নি। স্বপ্নে যারা আসে তারা বোধহয় সকলেই আমার চারপাশের মানুষ। বিষাদগ্রস্তমুখ, স্বপ্নভঙ্গের পর আমি কারও কথা মনে করতে পারিনা। প্রকৃত কোনও কারণ নেই, বাস্তব কোনও সম্ভাবনাও নেই, তবু এক একদিন সন্ধেবেলায় পশ্চিমের আকাশ যখন গাঢ় লাল হয়ে ওঠে তখন কেন জানি আমার মনে হয় সুদেষ্ণা একদিন আমারই হবে, জলভরা চোখদুটি তুলে বলবে, মানুদা, এই দেখ, আমি তোমার কাছেই ফিরে এলাম।

বাইরের ঘরে কলিংবেলটা বেজে উঠেছে। কেউ এল বোধহয়। কেউ গিয়ে দরজা খুলে দিল। আর অমনি কলকল করে কথা বলে উঠল অচেনা এক নারী। এই বাড়িটায় কত লোক আসে। আমি তাদের কাউকেই চিনি না।

শিঞ্জিনী উৎকর্ণ হয়েছিল। কি ভেবে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, বকুলমাসিরা এলেন বোধহয়। আজ পড়াশুনো থাক, মানুদা।

।। দুই ।।

টেবিলের ওপর অনেকক্ষণ হাতটা বিছিয়ে রেখেছি। একটু ধরা ধরা লাগছিল।

লোকটা ঝুঁকে পড়ে খুব মনোযোগ দিয়ে হাতের রেখাগুলো দেখছিল। লক্ষ্য করে দেখলাম লোকটার ভূতে পাক ধরেছে। বয়স পঞ্চাশের ওপরেই হবে। খুব অল্প বয়স থেকে বেঁচে থাকবার জন্যে কঠোর সংগ্রাম করলে মানুষের যেরকম চেহারা হয় লোকটাকে সেরকমই দেখতে। তোবড়ানো কৌটোর মত মুখে কাঁচাপাকা দাড়ি, মাথায় ঘন কোঁকড়ানো চুল, অধিকাংশই পাকা। চশমা নাকের ওপর ঝুলে পড়েছে। গায়ে ময়লা নীল শার্ট, পরণে ট্রাউজার্স। চেহারায় আলাদা কোনও বৈশিষ্ট্য নেই। কলকাতার রাস্তায় এরকম চেহারার লক্ষ লক্ষ লোক ঘুরে বেড়ায়। স্বাভাবিক অবস্থায় কেউ তাদের দিকে ফিরেও তাকায় না।

উল্টোদিকের চেয়ারে বসা রতন আর বাদল খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে লোকটার কাজকর্ম দেখছিল। ওরা দুজনেই জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিশ্বাসী। আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাস কিছুই নেই। ফুটপাতের চায়ের দোকান বলেই কিনা কে জানে, রামলাল টিউবলাইট লাগায়নি। ঘরের অল্প আলোয় লোকটা মুখ তুলল, তারপর খুব চিন্তিত হতাশ গলায় বলল, আপনার বয়স কত ?

আটাশ।

চাকরি - বাকরি কিছু করেন ?

না।

লোকটা একটু অবাক হয়ে বলল, মানে? চলছে কি করে?

টেবিলের ওপর থেকে রতন উত্তরটা দিল, ওর ডজন খানেক পোক্ত টিউশনি আছে। বিশুদা! এখন তো প্রাইভেট টিউটরদের রমরমা বাজার।

লোকটা কথাটা কানে তুলল না, বলল, বাড়িতে কে কে আছেন?
মা। দিদি ছিলেন, তার বিয়ে হয়ে গেছে।
বলে চকিতে একবার রতন আর বাদলের মুখ দেখে নিলাম। ওরা দুজনেই আমার ছোটবেলার বন্ধু। যে কথাটা বলেছি সেটা মিথ্যে নয়, আবার পুরো সত্যি নয়। বছর দুয়েক আগে আমার দিদি একটা ছেলের সঙ্গে পালিয়ে যায়। বি এ পাশ করেছিল, টিউশনিও করত। ছেলেটা ছিল ইলেকট্রিক মিস্ত্রি, উড়িষ্যায় বাড়ি। কি করে ভাব - ভালবাসা হয়েছিল তা কোনওদিন জানতেও পারিনি। প্রথম প্রথম কিছুদিন চিঠিপত্র লিখত। তাতে ঠিকানা থাকত না। বছরখানেক হল কোনও খোঁজ নেই।
লোকটা আমার হাত ছেড়ে দিয়ে পকেট হাতড়ে একটা বিড়ি ধরাল। তারপর একগাল ধোঁয়া ছেড়ে উদাস গলায় বলল, আপনার হাতে ভাল কিছু নেই। সামান্য যা কিছু প্রাপ্তি তা-ও চল্লিশের পর।
সামান্য কিছু প্রাপ্তির আশায় আমাকে আরও বারো বছর অপেক্ষা করে থাকতে হবে। জ্যোতিষশাস্ত্রে তেমন বিশ্বাস না থাকলেও আমার মনটা খারাপ হয়ে এল। লোকটা উঠবার উপক্রম করতেই আমি বললাম, কিছুই কি ভাল নেই?
অজান্তেই আবার খোলা হাতের পাঞ্জা বাড়িয়ে দিয়েছি। আমার গলায় কাতরতা ফুটে উঠল কি না কে জানে? চশমা ঠিক করে নিয়ে লোকটা একটু হাসল, আমার বাড়িয়ে দেয়া হাতের দিকে না তাকিয়েই বলল, আছে। একটা জিনিস ভাল আছে আপনার হাতে তবে সে জিনিস আপাতত আপনার কোনো কাজে লাগবে না। এ গ্রেট লাভ ! হ্যাঁ, আপনার জীবনে একটা বড় ভালবাসা আসবে!
কথাটা শেষ করে ম্যাজিশিয়ানের মত উঠে গেল লোকটা। আমরা তিন বন্ধু কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে বসে রইলাম। তারপর রতন চোখ টিপে বলল, আসবে কি রে ! এসেই গেছে বল! সেই সুদেষ্ণা না কি যেন নাম, তোর সেই ছাত্রী, হেভি দেখতে ছিল... বল না, গাঙ্গুলিবাগানের দিকে থাকত...
রতন কথাটা শেষ করল না। বাদলও মিটিমিটি হাসছিল। হায়, ওরা জানে না সুদেষ্ণা আমাকে ভালবাসেনা, কোনওদিনই বাসত না। তবু কেন জানি মনে হয় লোকটার ভবিষ্যৎবাণী মিথ্যে না-ও হতে পারে। এটা ঠিক, সুদেষ্ণারা যখন গাঙ্গুলিবাগানে থাকত তখন কিছুদিন আমি ওকে অংক শেখাতে গেছি। বারদুয়েক ভাড়া বাড়ি পাল্টাবার পর মাস ছয়েক হল সুদেষ্ণারা ঢাকুরিয়ায় ওদের নতুন ফ্ল্যাটে উঠে গেছে। রতন বা বাদল তখনও এসব খবর জানে না। জানবার কথাও নয়। রতন তার নতুন চাকরি নিয়ে ব্যস্ত। বাদল কি একটা অর্ডার সাপ্লাই-এর কাজ নিয়েছে, সারাদিন ব্যারাকপুর থেকে বনগাঁ চষে বেড়ায়। ওরা জানে না সুদেষ্ণা এখন বড় চাকরি করে।
পকেট থেকে ফিল্টার উইলস্-এর প্যাকেট বার করে আমাদের দিকে এগিয়ে দিতে দিতে রতন বলল, নে।
বাইরে গাঢ় হয়ে সন্ধে নামছিল। রামলালের দোকাল থেকে দূরের বাসস্ট্যান্ড দেখা যায়। অফিসফেরত ক্লান্ত মানুষেরা ঘরে ফিরছে। কোথায় একটা কবিতায় পড়েছিলাম এ সময় নিজস্ব নারীর কাছে ফেরে মানুষ। আমাদের নিজস্ব কোনও নারী নেই। হাতে জ্বলন্ত সিগারেট নিয়ে আমরা তিনজন দূরের দিকে তাকিয়ে আছি। হঠাৎ রতন বলল, বিশুদার কথা কিন্তু ফলে যায়। আমি কয়েকটা কেস জানি। মুডে না থকালে লোকটা সহজে কারও হাত ফাত দেখতে চায় না। শেয়ালদা গিয়েছিলুম আছে, ধরে নিয়ে চলে এলুম।
রামলালের দোকানে আমি ঢুকেছি সবার পরে। আমি যখন ঢুকি তখন বাদলের হাত দেখা চলছিল।
বাদল বলল, বিশুদার কথামত তাহলে এবার আমার একটা চাকরি হতে যাচ্ছে?
বাদলের গলায় কীই ছিল, রতন উত্তর দিল না। কিন্তু গ্রেট লাভ মানে কি ? মহান প্রেম? ভাবতে ভাবতে আমি উঠে দাঁড়াই। আমার বুক কাঁপে।
রতন বলে, যাচ্ছিস?
যাই।
বাইরের কোলাহলে বেরিয়ে এসে ভেতরে এক অদ্ভুত বেদনা অনুভব করি। সত্যিই কি কোনও মহান প্রেম অপেক্ষা করে আছে আমার জন্যে? খুব বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে জ্যোতিষশাস্ত্র। ল্যাম্পপোস্টের অজস্র আঁকিবুকিতে ভরা নিজের ডানহাতের পাঞ্জা চোখের সামনে মেলে ধরি আবার।

।। তিন ।।

ওমা, এতদিন পর আমাদের কথা মনে পড়ল, মানু?

দরজা খুলে মাসিমা বললেন। টিপ করে একটা প্রণাম সেরে নিয়ে বললাম, আজকাল বড় একটা সময় পাই না, মাসিমা। সকালবিকেল টিউশনি থাকে।

সুদেষ্ণা বলছিল, গোলপার্কে একদিন তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আমি বলেছি ধরে নিয়ে এলি না কেন? সেই গৃহপ্রবেশের দিন এসেছিল, তারপর তো তোমার কোনও খবর নেই।

আমি মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকি। মাসিমা বললেন, তোমার মেশোমশাইও তোমার কথা বলছিলেন। এসো, ভিতরে এসো।

বেশ বড়ই ফ্ল্যাটটা। গৃহপ্রবেশের দিন খেয়াল করে দেখা হয়নি। এখনও বোধহয় ভাল করে সাজানো হয়নি। পুরনো আসবাব এই নতুন ফ্ল্যাটে একটু বেমানানই লাগছে। পাশের ঘর থেকে সুদেষ্ণার বন্ধুদের হা-হা হি-হি শব্দ ভেসে আসছিল। সুদেষ্ণার গলাও পাওয়া যাচ্ছে মাঝেমাঝে। পুষকণ্ঠে দু-কলি রবীন্দ্রসঙ্গীত ভেসে এল। বুঝতে পারি এ বাড়িতে একটা উৎসব চলছে তখন।

বাইরে বিকেল ফুরিয়ে এল। ঘরের ভেতরে উজ্জ্বল নিয়ন আলো। মাসিমা বললেন, সুদেষ্ণার একটা প্রমোশন হয়েছে বলেও বন্ধুদের একটা পার্টি দিয়েছে আজ। খুব ভাল করেছ আজ এসে। তারপর কি ভেবে ডাকলেন--- সুদেষ্ণা ! সুদেষ্ণা!

যাই, মা!

ভেতর থেকে সাড়া দিয়েছে সুদেষ্ণা। তারপর এক ছুটে বেড়িয়ে এল ডাইনিং স্পেসে। চন্দনরঙের একটা তাঁতসিল্কের শাড়ি পরেছে। হাতে কগাছা চুড়ি। কপালে বড় খয়েরি টিপ, ঠোঁটে হালকা লিপস্টিকের ছোঁওয়া। এই সামান্য প্রসাধনেই সুদেষ্ণাকে আজ দেবী প্রতিমার মত দেখাচ্ছে। মুগ্ধ বিহ্বল দৃষ্টিতে আমি সুদেষ্ণার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি।

তির্যক ভ্রূকুটি হেনে সুদেষ্ণা বলে, পথ ভুলে এলে বুঝি? যাক গে, ভাল দিনেই এসেছ। এস--

বলে এগিয়ে এসে আজই প্রথম আমার হাত ধরল সুদেষ্ণা। আমি এখন সুদেষ্ণার শরীরের ঘ্রাণ পাচ্ছি। বুকের খুব গভীরে আমি আসন্ন এক ভূমিকম্পনের আগমনধ্বনি শুনতে পাই। চকিতে একবার দেখতে পাই সেই জ্যোতিষীর মুখখানা।

ঘরের ভেতরে তিনটি মেয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে। একটি ছেলে খাটের ওপরে আধশোওয়া। অভিজাত চেহারায় ছেলেটির চোখে দামি ফ্রেমের হাই-পাওয়ার চশমা। মৃদু একটা বিদেশি মিউজিক বাজছে টেপরেকর্ডারে।

সুদেষ্ণা পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিল, এর নাম বিদিশা, এ হচ্ছে সায়নী আর এ নীলা। আর ইনি হচ্ছেন আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ দেবপ্রিয় রায়।

চারজোড়া চোখ এখন আমার দিকে স্থির। হাত জোড় করে নমস্কার করতে গিয়ে শুনতে পেলাম সুদেষ্ণা বলছে, ইনি আমার এককালের গৃহশিক্ষক, মানুদা। মানব চক্রবর্তী।

আমি বোকার মত দাঁড়িয়ে আছি। বিছানায় উঠে বসে দেবপ্রিয় নামের ছেলেটি কৌতুকভরা দৃষ্টিতে আমাকে দেখছিল। এই দৃষ্টি আমি চিনি। উপেক্ষার ভাষা চিনতে আমার ভুল হয় না।

সুদেষ্ণা বলছিল, দেবপ্রিয়দা আমাদের শুধু বন্ধুই নয়, আরও অনেক কিছু। উনি একটা বিখ্যাত মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানির ফিনান্স ম্যানেজার। আরও অনেক গুণ আছে ওঁর, সেসব ক্রমশ প্রকাশ্য।

বিদিশা বলল, দেবপ্রিয়দা এখন আমাদের গান গেয়ে শোনাবেন।

গম্ভীর মুখ করে দেবপ্রিয় বলল, এখন আবার গান কেন?

আদুরে গলায় সুদেষ্ণা বলল, তুমি কিন্তু কথা দিয়েছিলে দেবপ্রিয়দা!

সে তোমাকে একা একা কোনওদিন শোনাব। গানের দিন কি শেষ হয়ে গেল? সারাজীবনইতো পড়ে আছে, সুদেষ্ণা।

রাঙামুখে সুদেষ্ণা বলল, আবার ঠাট্টা শু করেছ?

ঘরের বাকিরা হি হি করে হেসে উঠল। সায়নী বলল, সে যখন শোনবে তখন আমরা তো আর শুনতে পাব না।

দেবপ্রিয়র দিকে তীব্র কটাক্ষ হেনেছে সুদেষ্ণা। কি যে অসম্ভব সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে ! আমি স্থির জানি, সুদেষ্ণার ওই লজ্জারাঙা মুখ চিরকালের জন্যে গেঁথে রইল আমার বুকে। চিতার আগুন ছাড়া এ ছবি পুড়বে না।
ওরা কেউ এখন আর আমাকে লক্ষ করছে না। আমি অশরীরীর মত নিঃশব্দে বেরিয়ে আসি ঘর থেকে।

।। চার ।।

শিঞ্জিনীর বাবা কোথায় বেরোচ্ছিলেন। হঠাৎ কি ভেবে পড়ার ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ালেন। সাধারণত এ ঘরটায় উনি আসেন না। আমি একটু উৎকণ্ঠা নিয়ে তার মুখের দিকে তাকাই। কয়েক সেকেণ্ড কি ভাবলেন ভদ্রলোক, তারপর হতাশগলায় বললেন এদেশের কোনও ভবিষ্যত নেই, মাস্টার। দিনদুপুরে খুন, ডাকাতি, রাহাজানি---কারও কোনও ভ্রুক্ষেপ নেই ! আর পুলিশ ? হুঁ হ্....
বলতে বলতে ফিরে যাচ্ছিলেন ভদ্রলোক হঠাৎই কি মনে পড়তে বললেন, সোম - মঙ্গল দুদিন আমরা থাকছি না, মাস্টার। কোন্নগরে যেতে হচ্ছে। সেখানে আমার এক শ্যালিকার বিয়ের ব্যাপার আছে।
বলে ঘড়ি দেখতে দেখতে বেরিয়ে গেলেন ভদ্রলোক। কেন কে জানি শিঞ্জিনী কথাটা আমাকে বলেনি। একটু রাগ হচ্ছিল, বললাম, দুদিন থাকবে না, কই, আমাকে বলনি তো ?
শিঞ্জিনী আমার কথার উত্তর দিচ্ছে না, মাথা নিচু করে বসে আছে। কালও সারারাত ভাল ঘুম হয়নি, বিছানায় এপাশ-ওপাশ করে কেটেছে। কপালে দুপাশের শিরা দপদপ করছে সকাল থেকে, ভার হয়ে আছে মাথা। বিরস গলায় আমি বললাম, তোমার কি পড়াশুনা করবার ইচ্ছে নেই, শিঞ্জিনী ? তোমাদের এইসব ব্যাপারগুলো আগে থেকে জানা থাকলে আমার কিছু সুবিধে হয় !
শিঞ্জিনীর বাবা লোকটাকে আমি পছন্দ করি না। তার জন্যেই হঠাৎ ভেতরটা এত তোতো হয়ে উঠল কিনা কে জানে ? শিঞ্জিনী কি ভাবল খানিক, তারপর গম্ভীরমুখে বড় বড় চোখদুটি তুলে বলল, আমি বোধহয় আপনাকেখুব কষ্ট দিই, মানুদা !
কিছু না ভেবেই আমি বলি, তা একটু দাও বইকি !
শিঞ্জিনীর চোখদুটি ছলছল করে ওঠে, মুখ নিচু করে সে বলে, আপনার অনেক কষ্ট। আমি জানি।
শিঞ্জিনীর গলায় কি ছিল, আমার সমস্ত শরীর থরথর করে কেঁপে ওঠে। চোখ অসম্ভব ভারী। ওই ফ্রকপরা ছোট্ট কিশোরীটিকে আমি আর ছোট বলে ভাবতে পারি না। এক মুহূর্তেই সে যেন পরিপূর্ণ নারী হয়ে উঠেছে। আমার খুব ইচ্ছে করে ওর কচি মুখখানা দুহাতের অঞ্জলিতে তুলে ধরি। প্রাণপণে এই পাপ ইচ্ছে দমন করে মনে মনে বলি, কি জান তুমি, শিঞ্জিনী ? কতটুকু জান ?
শিঞ্জিনীর চোখের পাত্রদুটি জলে ভরে উঠছিল। আমি শিঞ্জিনীকে বলতে চাই, আমার জীবনে কোনও মহান প্রেমের আগমনবার্তা নেই আর। না, সুদেষ্ণাকেও আমি আর চাই না, শিঞ্জিনী !
কোনও কথাই আমার বলা হয় না। অস্ফুট এক নারীর মুখোমুখি স্তব্ধ হয়ে বসে থাকি শুধু।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com